৯

ধর্ম
Religion

একটি সার্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ হিসাবে ধর্ম বরাবরই নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার একটি অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ছিল। ধর্মের উৎপত্তি থেকে শুরু করে সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী, বিভিন্ন বিষয়ে নৃবিজ্ঞানীরা চিন্তাভাবনা করেছেন। ধর্ম কি ও কেন, এ প্রশ্নকে ঘিরে নৃবিজ্ঞানে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাত পাওয়া যায়, যেগুলো এই জ্ঞানকান্ডে বিদ্যমান বিভিন্ন তাত্ত্বিক ঘরানার সাথে সম্পর্কিত। ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা জাদু, মিথ, আচার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপরও আলোকপাত করেছেন।

এই ইউনিটে আপনি জানতে পারবেন ধর্ম তথা সংশ্লিষ্ট আরো কিছু মৌলিক ধারণা - মিথ, আচার, সর্বপ্রাণবাদ, জাদু ইত্যাদি - কোন্ ধরনের অর্থে নৃবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। এসব বিষয় সম্পর্কে নৃবিজ্ঞনীদের বিভিন্নমুখী অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথেও আপনি প্রাথমিকভাবে পরিচিত হবেন। সবশেষে নির্বাচিত কিছু ধর্মীয় আন্দোলনের বিবরণ রয়েছে, যেগুলোর প্রেক্ষিতে আপনি দেখবেন যে ইতিহাসের প্রবাহে ধর্ম সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

- পাঠ - ১ : ধর্ম : মিথ ও আচার
- পাঠ - ২ : সর্বপ্রাণবাদ, মহাপ্রাণবাদ ও মানা
- পাঠ - ৩ : ধর্ম, জাদু ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক
- পাঠ - ৪ : ধর্মীয় আন্দোলন : কার্গো কাল্ট, যগুক্ষ্ম ও ফরায়েজী আন্দোলন

পাঠ - ১

ধর্ম : মিথ ও আচার
Religion : Myth & Rituals

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- 'ধর্ম' বলতে নৃবিজ্ঞানে কি বোঝানো হয়, সে সম্পর্কে ধারণা
- নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের কার্যাবলী
- 'মিথ' কি, এবং মিথের ব্যাখ্যা
- ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব ও সামাজিক তাৎপর্য বিষয়ে নৃবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

নৃবিজ্ঞানে ধর্ম

ধর্ম একটি সার্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ, অর্থাৎ সকল সমাজেই কোন না কোন আকারে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের উপস্থিতি রয়েছে। এক ধর্মের অনুসারীদের কাছে অন্য ধর্মের অনুসারীদের বিশ্বাসসমূহ ভ্রান্ত বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু নৃবিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে সকল ধর্মকেই সমান মর্যাদা দিয়ে থাকেন। এছাড়া এমন অনেক জনগোষ্ঠী আছে যাদের বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান বৈশ্বিকভাবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত এমন কোন নির্দিষ্ট ধর্মের আওতায় পড়ে না। মিশনারীবৃন্দসহ অনেকে কোন কোন ক্ষেত্রে এমন জনগোষ্ঠীদের 'ধর্মহীন' হিসাবে বিবেচনা করেছেন, তবে নৃবিজ্ঞানীরা তেমনটি করেন নি। বরং তাঁরা ধর্মের সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করে এটিকে একটি সার্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ হিসাবে গণ্য করেছেন, যার উপস্থিতি মানব ইতিহাসের সূচনালগ্নেও ছিল।

নৃবিজ্ঞানে সাধারণভাবে ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত সত্তা, ক্ষমতা বা শক্তি সংক্রান্ত বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সামষ্টিক রূপ হিসাবে।

নৃবিজ্ঞানে সাধারণভাবে ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত সত্তা, ক্ষমতা বা শক্তি সংক্রান্ত বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সামষ্টিক রূপ হিসাবে। 'অতিপ্রাকৃত' বলতে বোঝায় সেইসব বিষয় যেগুলোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক জগতের বাইরে বা উর্ধ্বে বলে গণ্য করা হয়, যেগুলোর অস্তিত্ব বা সত্যতা নির্ভর করে মানুষের বিশ্বাসের উপর। প্রতিটা সমাজেই 'অতিপ্রাকৃত' জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ককে ঘিরে বিভিন্ন বিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্ম লক্ষ্য করা যায়। তবে সকল সংস্কৃতিতে 'অতিপ্রাকৃত' ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা হয় না। যেমন, ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এমন অনেকের কাছে এসব সত্তা চারপাশের গাছপালা পাহাড়-পর্বত জীবজন্তুর চাইতে কোন অংশে কম 'বাস্তব' নয়।

ধর্মের নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নে ডুর্খাইমের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ধর্মের একটি সার্বজনীন সংজ্ঞা প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনি 'অতিপ্রাকৃত'-এর বদলে 'পবিত্র'-এর ধারণার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

ধর্মের প্রতি নৃবিজ্ঞানীদের আগ্রহ দেখা গিয়েছিল একটি বিদ্যাজাগতিক জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের আবির্ভাবের সময়কাল থেকেই। উনিশ শতকে যখন নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা সাধারণভাবে 'বিবর্তনবাদ' দ্বারা সংগঠিত ছিল, তখন ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ কিভাবে ঘটে থাকতে পারে, এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ব্যাপারে নৃবিজ্ঞানীরা অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। টায়লর, ফ্রেজার প্রমুখ নৃবিজ্ঞানীর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। পক্ষান্তরে পরবর্তীতে যখন বিবর্তনবাদের বদলে 'ক্রিয়াবাদ' নৃবিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন ধর্ম সমাজ বা ব্যক্তির কি চাহিদা পূরণ করে, এ প্রশ্নটাই মুখ্য ছিল। এ প্রসঙ্গে ধর্মের নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নে ডুর্খাইমের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ধর্মের একটি সার্বজনীন সংজ্ঞা প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনি 'অতিপ্রাকৃত'-এর বদলে 'পবিত্র'-এর ধারণার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম হচ্ছে 'পবিত্র' বিভিন্ন কিছুকে ঘিরে যেসব বিশ্বাস ও চর্চা দেখা যায় সেগুলোর সামষ্টিক রূপ, যেসব বিশ্বাস ও চর্চা সমাজের সদস্যদের মধ্যে যৌথতা ও সংহতি এনে দেয়। ডুর্খাইমের মতে কোন বস্তু পবিত্র হয়ে ওঠে এর কোন অর্ন্তনির্হিত বৈশিষ্ট্যের কারণে নয়, বরং তা সমাজের সামষ্টিকতার প্রতিভূ হিসাবে কাজ করে বলেই।

একটা দীর্ঘ সময় ধরে ধর্মের নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন মূলতঃ আবর্তিত হয়েছিল তথাকথিত বিভিন্ন 'আদিম' সমাজের বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের উপর মাঠকর্মকে ঘিরে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে নৃবৈজ্ঞানিক মাঠকর্মের নজর সরে গিয়েছিল ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টধর্ম প্রভৃতি বৈশ্বিক ধর্মের (world religion) স্থানিক রূপের উপর। সে সাথে ডুর্খাইমীয় ক্রিয়াবাদের পরিবর্তে ম্যাক্স ওয়েকরের তাত্ত্বিক প্রভাবও অধিকতর দেখা গিয়েছিল, যিনি ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধর্মের অধ্যয়নে আগ্রহী ছিলেন। এক্ষেত্রে ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যিনি ধর্মকে একটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হিসাবে দেখার উপর, অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থানিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীকের অর্থ অনুধাবন করার উপর, জোর দিয়েছিলেন। কিছুটা সীমিত পরিসরে ধর্মের নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবও কিছুটা লক্ষ্য করা গেছে। উল্লেখ্য, ডুর্খাইমীয় বিশ্লেষণে যেখানে ধর্মকে দেখা হয়েছে সামাজিক সংহতির বাহন হিসাবে, সেখানে মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম মূলতঃ কাজ করে শ্রেণীগত ও অন্যান্য সামাজিক বৈষম্য টিকিয়ে রাখার একটা হাতিয়ার হিসাবে। বলা বাহুল্য, ধর্মের নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন উনবিংশ শতকীয় বিবর্তনবাদী প্রবণতা থেকে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে, এতে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আরো বিভিন্ন ধারা যুক্ত হয়েছে, যেখানে নৃবিজ্ঞানে সাধারণভাবে সূচিত বিভিন্ন তাত্ত্বিক, পদ্ধতিগত ও অন্যান্য পরিবর্তনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মের নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন উনবিংশ শতকীয় বিবর্তনবাদী প্রবণতা থেকে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে, এতে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আরো বিভিন্ন ধারা যুক্ত হয়েছে, যেখানে নৃবিজ্ঞানে সাধারণভাবে সূচিত বিভিন্ন তাত্ত্বিক, পদ্ধতিগত ও অন্যান্য পরিবর্তনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মের কার্যাবলী

সুদূর অতীত থেকেই মানব সমাজে ধর্মের উপস্থিতি ছিল, এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ফলে আধুনিক সমাজে ধর্ম ক্রমশঃ অবান্তর হয়ে পড়বে, অনেকের এরকম ধারণাকে ভূল প্রমাণিত করেই বিভিন্ন সমাজে ধর্ম এখনো সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে। স্বভাবতঃই সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকা ও কার্যাবলী সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীদের যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। ধর্মের কার্যাবলীর মধ্যে যেগুলি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে নৃবিজ্ঞানীদের কাছে বিবেচিত হয়েছে, সেগুলির কয়েকটি নীচে আলোচিত হল।

নিয়ম ও অর্থময়তার অনুসন্ধান

ধর্মের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর মধ্যে একটি হল জীবন ও জগতকে বোধগম্য, অর্থময় করে তুলে ধরা। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের যেসব বিষয় ব্যক্তি তথা সমাজের কাছে গুরুত্বপুর্ণ, ধর্ম সেগুলোর ব্যাখ্যা দেয়। জীবন-মৃত্যু ও জগত সৃষ্টির রহস্য থেকে শুরু করে সমাজ ও এর বিভিন্ন অংশের উৎপত্তি, মানুষের সাথে প্রকৃতির এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক, বিভিন্ন বিষয়ের উপর ধর্ম আলোকপাত করে। এভাবে ধর্ম গড়ে দেয় জীবন ও জগতকে অনুধাবনের বিশেষ ব্যবস্থা, যা মূলতঃ প্রতীকী উপায়ে বাস্তবতার এমন একটি প্রতিরূপ গড়ে তোলে যার মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার অর্থ, তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা খোঁজে।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার নিরসন

ধর্মীয় অনেক চর্চার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল নানান ধরনের মানবীয় কর্মকান্ডের সফলতা নিশ্চিত করা। ইশ্বর, বিভিন্ন দেবদেবী বা অন্যান্য অতিপ্রাকৃত সত্তার উদ্দেশ্যে মানুষ প্রার্থনা জানায় বা নৈবেদ্য উৎসর্গ করে এই আশায় যে তারা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। অতিপ্রাকৃত সত্তা বা শক্তিসমূহকে নিজেদের অনুকূলে আনা বা রাখার জন্য বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। যেসব ক্ষেত্রে মানবীয় কর্মকান্ডের ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা যায়, সেসব ক্ষেত্রে এ ধরনের আচার অনুষ্ঠানের নিবিড়তাও লক্ষ্য করা যায়। প্রযুক্তিগতভাবে সব কাজ ঠিকমত সম্পন্ন করার পরও নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিভিন্ন কারণে কৃষকের ফসলহানি ঘটতে পারে, বা একজন নাবিক দুর্ঘটনার মুখে পড়তে পারে। যেসব ক্ষেত্রে এ ধরনের আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, সেসব ক্ষেত্রে মানুষকে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস বা চর্চাসমূহকে অনেকে 'কুসংস্কার' হিসাবে গণ্য করতে পারে, তবে নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এগুলো পরোক্ষভাবে

হলেও ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রশমিত করার মাধ্যমে কা খত ফলাফল অর্জনে সহায়তা করে।

সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা

ধর্মের কিছু কার্যাবলী রয়েছে যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সমাজ ব্যবস্থাকে টিকে থাকতে সহায়তা করে। যেমন, ভাল-মন্দ সংক্রান্ত ধর্মীয় ধ্যানধারণা সমাজের সদস্যদের সামনে বিশেষ কর্তৃত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়, যেগুলোর অনুশাসন সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান সামাজিক বিন্যাসকে যৌক্তিক বা গ্রহণযোগ্য হিসাবে তুলে ধরে। আবার বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের মধ্যে যৌথতার শক্তিশালী অনুভূতি ও বোধ তৈরী হয়। সমাজ ও বিশ্বজগতে ব্যক্তির অবস্থান নিরূপণ করে দেওয়ার মাধ্যমে ধর্ম ব্যক্তিকে তার নিজের পরিচয় ও বৃহত্তর পরিমন্ডলের সাথে যুক্ততার বোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পারলৌকিক পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ধর্ম দুর্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন বা নিপীড়িত মানুষদের ইহজাগতিক দুঃখ কষ্টকে মেনে নিতে সাহায্য করে। ধর্মের বাণী যখন এভাবে সমাজের ব্যাপক সংখ্যক সদস্যদের হতাশা, ক্ষোভ, ক্রোধ ও গ্লানি মোচনের কাজ করে, তখন পরোক্ষভাবে একটা অসম বা অন্যায় ইহজাগতিক ব্যবস্থাকেই হয়ত টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে ধর্ম। তবে ধর্ম যে সবসময় শুধু স্থূল অর্থে 'চেতনানাশক' হিসাবে কাজ করে, তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ধ্যান ধারণা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে, বা অধিকতর কাম্য সমাজ ব্যবস্থা গড়তেও সাহায্য করে। অন্ততঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সূচনালগ্নে তেমনটা দেখা গেছে।

মিথ (myth)

মিথ বলতে সাধারণতঃ সেসব ধর্মীয় কাহিনীকে বোঝায় যেগুলিতে বিশ্বজগত ও এর বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি সংক্রান্ত বৃত্তান্ত বিধৃত রয়েছে।

মিথ বলতে সাধারণতঃ সেসব ধর্মীয় কাহিনীকে বোঝায় যেগুলিতে বিশ্বজগত ও এর বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি সংক্রান্ত বৃত্তান্ত বিধৃত রয়েছে। প্রতিটা সমাজেই এ ধরনের কাহিনী প্রচলিত রয়েছে যেগুলিতে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিভাবে জগতের সৃষ্টি হল, কিভাবে বিভিন্ন নিয়ম-আচার-প্রথার উৎপত্তি ঘটল, ইত্যাদি। সাধারণতঃ এসব কাহিনীতে দেবদেবী বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী চরিত্রদের কর্মকান্ডের বিবরণ থাকে। তবে এগুলিতে সমাজের মানুষদের বিভিন্ন বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতিফলনও থাকে। সে হিসাবে মিথসমূহ আসলে বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার বৈধতা প্রণয়নের হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার পৌরাণিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব্রাহ্মণদের, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের, পায়ের পাতা থেকে শুদ্রদের ইত্যাদি। অবশ্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, যে কোন মিথেরই একাধিক ভাষ্য থাকতে পারে যেগুলি সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর পরস্পরবিরোধী অবস্থানকে নির্দেশ করে। যেমন, নিম্নবর্ণের হিন্দু জাতিসমূহের মধ্যে এমন কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় যেখানে বলা হয় যে, তারা আসলে উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিল, কিন্তু কোন দেবতার অভিশাপে বা ব্রাহ্মণদের শঠতার কারণে পরবর্তীতে নীচুজাতের বলে বিবেচিত হয়েছে। এভাবে দেখলে মিথসমূহ শুধুমাত্র বিদ্যমান সামাজিক বাস্তবতার মতাদর্শিক প্রতিফলন হিসাবেই কাজ করে না, বরং সেই বাস্তবতাকে প্রশ্ন করার বা পাল্টে ফেলার সূত্রও ধারণ করতে পারে।

মিথের কাঠামোগত বিশ্লেষণ

কাঠামোবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মনে করা হয়, মানুষের মনের কতগুলি বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলোর মূলে রয়েছে মানব মস্তিষ্কের কিছু সাধারণ কাঠামোগত বিষয়।

ফরাসী নৃবিজ্ঞানী লেভি-স্ট্রস প্রণীত একটি তাত্ত্বিক রূপরেখা, যা কাঠামোবাদ (structuralism) নামে পরিচিত, বিভিন্ন সমাজের মিথসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণে যথেষ্ট অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছে। কাঠামোবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মনে করা হয়, মানুষের মনের কতগুলি বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলোর মূলে রয়েছে মানব মস্তিষ্কের কিছু সাধারণ কাঠামোগত বিষয়। এসবের ফলে দেখা যায় যে, স্থান কালের পার্থক্য সত্ত্বেও একটা মৌলিক স্তরে সকল মানুষের চিন্তা প্রক্রিয়া একই ধরনের। এরকম একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সকল মানব সমাজই তাদের চারপাশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক জগতকে বিভিন্ন বর্গে ভাগ করে। এধরনের বর্গীকরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্বৈত বৈপরীত্য (binary

opposition/contrast) বা বিপরীত জোড় পদের ব্যবহার--ভাল বনাম মন্দ, জীবন বনাম মৃত্যু, পুরুষ বনাম নারী, প্রাপ্তবয়স্ক বনাম শিশু, উঁচু বনাম নীচু ইত্যাদি। বিভিন্ন মিথ, রূপকথা প্রভৃতির মূলে রয়েছে এ ধরনের কিছু সাধারণ বিপরীত জোড় পদ, যেগুলোর বিভিন্ন ধরনের বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে আপাতঃদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক কাহিনী। কাঠামোবাদী নৃবিজ্ঞানীরা তাদের বিশ্লেষণে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, কিভাবে বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত মিথ ও অন্যান্য কাহিনীর মূলে রয়েছে অভিন্ন কিছু মৌলিক উপাদান, কিভাবে এই মৌলিক উপাদানগুলির বিবিধ রূপান্তর ও নব নব বিন্যাস দিয়ে গড়ে ওঠে আলাদা আলাদা কাহিনী।

কাঠামোবাদী নৃবিজ্ঞানীরা তাদের বিশ্লেষণে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, কিভাবে বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত মিথ ও অন্যান্য কাহিনীর মূলে রয়েছে অভিন্ন কিছু মৌলিক উপাদান, কিভাবে এই মৌলিক উপাদানগুলির বিবিধ রূপান্তর ও নব নব বিন্যাস দিয়ে গড়ে ওঠে আলাদা আলাদা কাহিনী।

বৈপরীত্যের ভিত্তিতে মানুষ জীবন ও জগতকে অনুধাবন করলেও বাস্তবে এবং কল্পনায় এমন অনেক সত্তা, বস্তু বা বিষয় রয়েছে যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বৈপরীত্যের যুগপৎ সমাহার দেখা যায়। বিভিন্ন মিথ এবং সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে এই ধরনের তৃতীয় বর্গ একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। যেমন, পৌরাণিক কাহিনীসমূহে অর্ধ-মানব অর্ধ-দেবতা, অর্ধ-মানব অর্ধ-পশু, অর্ধ-নর অর্ধ-নারী ইত্যাদি চরিত্রের ব্যাপক সাক্ষাত মেলে। সামাজিকভাবেও এই ধরনের 'মিশ্র' বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অনেক কিছুকে ঘিরে আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান লক্ষ্য করি। যেমন, হিজড়ারা ঠিক পুরুষও না নারীও না, বরং তৃতীয় একটি লিঙ্গীয় বর্গের মানুষ। সামাজিকভাবে তারা প্রান্তিক হলেও তাদের কিছু বিশেষ 'ক্ষমতা' আছে বিশ্বাস করা হয়। এভাবে কাঠামোবাদীরা তাদের বিশ্লেষণ শুধুমাত্র মিথ, রূপকথা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সীমিত রাখেন নি, বরং সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যান্য আরো বহু বিষয় বিশ্লেষণে তারা একই ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।

আচার

আচারকে (ritual) সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে বিশ্বাসের প্রথাবদ্ধ আচরিত রূপ হিসাবে (belief in action)। মিথ যদি হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি প্রধান আকর, তবে আচার হচ্ছে তার আচরণগত অভিব্যক্তির অন্যতম একটি ক্ষেত্র। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় অন্যান্য প্রাত্যহিক বা সাধারণ কর্মকান্ড থেকে আলাদা ছকে, ভিন্ন আঙ্গিকে। আচারে অংশগ্রহণকারীদের সম্পন্ন করতে হয় নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতা, যেগুলির মাধ্যমে প্রতীকীভাবে ভিন্ন একটা জগতে তারা প্রবেশ করে। ধর্মীয় আচারের ক্ষেত্রে এই জগতটা হচ্ছে পবিত্রতার, অতিপ্রাকৃত সত্তা ও শক্তিসমূহের বলয়। এই জগতের সত্তাসমূহের সাথে যোগাযোগের মানসে বা সেখানকার শক্তিসমূহকে আয়ত্ত করার প্রয়াসে মানুষ আচার পালন করে। আচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এতে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় প্রতিটি আচরণ, অঙ্গভঙ্গী, উচ্চারণ ইত্যাদি বিশেষ প্রতীকী গুরুত্ব বহন করে। এজন্য আচারকে অনেকে 'প্রতীকী কর্মসম্পাদন' (symbolic action) বলেও আখ্যায়িত করেছেন। খ্রিস্টীয় 'ম্যাস' (mass) অনুষ্ঠানে গীর্জায় সমবেত উপাসকরা যে রুটিখন্ডগুলো খায়, বা হিন্দুরা পূজার যে প্রসাদ খায়, সেগুলো ঠিক 'খাদ্য' নয়। নিত্যকার আহার্য অন্যান্য খাদ্য থেকে সেগুলো প্রতীকীভাবে ভিন্ন। তেমনি মুসল্লীরা যখন নামাজের আগে অজু করে, সেটার সাথে সাধারণ প্রক্ষালনের পার্থক্য রয়েছে আঙ্গিক, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের দিক থেকে।

মিথ যদি হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি প্রধান আকর, তবে আচার হচ্ছে তার আচরণগত অভিব্যক্তির অন্যতম একটি ক্ষেত্র।

সাদা চোখে দেখলে বেশীর ভাগ আচারের কোন ব্যবহারিক তাৎপর্য নেই, এই অর্থে যে, আচার পালন না করেই বিভিন্ন কর্মকান্ড সমাপ্ত করা সম্ভব। যেমন, একটা নূতন বাড়ি বানানো শেষ করেই সেখানে বসবাস শুরু করা যায়, এজন্য মিলাদের আয়োজন করাটা প্রযুক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু অনেকের কাছে সামাজিক ভাবে তা কাম্য। কোন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই একটা মৃতদেহকে মাটি চাপা দেওয়া বা পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে খুব কম ক্ষেত্রেই কেউ তা করার কথা ভাবে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী যথাসময়ে কিছু আচার সম্পাদন করা জরুরী দৈব অনুগ্রহ, আশীর্বাদ, কৃপা ইত্যাদি লাভের জন্য। তবে সামাজিকতা রক্ষাও আচার পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। আচার অধ্যয়নে নৃবিজ্ঞানীরা ব্যাপকতর অর্থে এই 'সামাজিকতা'র বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সকল সমাজেই এমন বহু আচার রয়েছে যেগুলোতে সমাজের বহু সদস্যের মিলিত অংশগ্রহণ রয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ

থেকে এসব আচার পালনের উপলক্ষ বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এ ধরনের আচার সমাজের সদস্যদের যৌথতা ও সংহতি প্রকাশের ও লালনের প্রধান মাধ্যম।

অবস্থান্তরের আচার

বিভিন্ন ধরনের আচারের মধ্যে একটা বিশেষ শ্রেণীর আচার নৃবিজ্ঞানীদের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যেগুলোকে বাংলায় অবস্থান্তরের আচার (rites of passage) বলা যেতে পারে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে, এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উপনীত হয়, বদলে যায় তার সামাজিক ভূমিকা বা পরিচিতি। এই অবস্থা বদলের সময়গুলোতে - যেমন, একটা শিশুর নাম করণ, একজন নারী বা পুরুষের বিয়ে, ধর্মীয় দীক্ষা গ্রহণ, ইত্যাদি বহু উপলক্ষে--বিভিন্ন আচার পালন করা হয়। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ভ্যান গেনেপ প্রথম লক্ষ্য করেন যে, বিভিন্ন সমাজে পালিত অবস্থান্তরের আচারসমূহের কিছু সাধারণ কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উপনীত হওয়ার মাঝপথে কিছু সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যবর্তী একটা অবস্থা পেরুতে হয়, যেখানে তার বা তাদের অবস্থা, ভূমিকা, পরিচিতি কিছুটা দ্ব্যর্থবোধক--ঠিক এখানেও না ওখানেও না এমন একটা অবস্থা। গায়ে হলুদ হচ্ছে, এমন একজন নারী ঠিক আর দশটা অবিবহাতি নারীর মত নয়, তবে কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহিতা হিসাবেও গণ্য করা যায় না। কিছু সময়ের জন্য এই যে একটা মধ্যবর্তী অবস্থা পেরুতে হয়, সেটাকে liminal stage হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (liminal কথাটি এসেছে limen থেকে, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে দ্বারপ্রান্ত বা দোরগোড়া--ঘরে ঢোকার মুখে বা ঘর থেকে বেরুনোর পথে দরজার চৌকাঠের নীচের যে অংশ আমরা পেরুই--যেটা ঠিক ঘরের ভেতরেও না, পুরোপুরি বাইরেও না)।

ভ্যান গেনেপ লক্ষ্য করেন যে, যে ব্যক্তিকে ঘিরে অবস্থান্তরের আচার পালিত হয়, তাকে প্রথমে প্রতীকী ভাবে প্রাথমিক অবস্থা (initial stage) থেকে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করা হয়, এধরনের প্রতীকী কর্মকান্ড হল বিচ্ছিন্নকরণের আনুষ্ঠানিকতা (rites of separation)। পরবর্তীতে নূতন অবস্থায় প্রবেশকে চিহ্নিত করার জন্য সম্পন্ন হয় আরো কিছু প্রতীকী কর্মকান্ড, বরণমূলক বা পুনরেকত্রীকরণের আনুষ্ঠানিকতা (rites of reintegration), যেগুলোর পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপনীত হয় চূড়ান্ত অবস্থায় (final stage), যখন নূতন একটি ভূমিকা বা পরিচয়ে সে আবার সমাজ জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহে শামিল হতে পারে। বিচ্ছিন্নকরণের আনুষ্ঠানিকতার পর পুনরেকত্রীকরণমূলক আনুষ্ঠানিতা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবস্থান করে মধ্যবর্তী অবস্থায় (liminal stage), যেখানে তাকে আহার-পরিধান-চলন-বলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়।

অবস্থান্তরের আচার অনেক সময় দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে, যেখানে বহু ব্যক্তি একই সাথে নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উপনীত হয়। অনেক সমাজে একই গ্রাম বা এলাকায় বসবাসরত একটা নির্দিষ্ট বয়সসীমার কিশোর-কিশোরীদের ঘিরে কিছু আচার (initiation rites) পালিত হয়, যেগুলোর শেষে তারা সমাজে প্রাপ্তবয়স্কের মর্যাদা পায়। যেমন, পূর্ব আফ্রিকার কাণ্ডরু জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের আচারের অংশ হিসাবে একটা নির্দিষ্ট বয়সের কিশোরদের নির্ধারিত একটা দিনে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাদের সবাইকে নগ্ন অবস্থায় রেখে মাথা ও শরীরের অন্যান্য স্থানের চুল কামিয়ে ফেলা হয়, এবং এরপর তাদের সবার খৎনা করা হয়। এভাবে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা শেষে কিশোররা আবার যখন গ্রামে ফেরে, তখন তাদের সবার নূতন নাম থাকে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য অনুমোদিত সকল কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারে। দলীয় অবস্থান্তরের আচারের মধ্যবর্তী অবস্থা চলাকালে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাম্য, সহমর্মিতা ও যৌথতার নিবিড় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নৃবিজ্ঞানী ভিক্টর টার্নার এই অবস্থাকে কমিউনিটাস (communitas) হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। হজ্জ্ব পালনরত বা পুণ্যস্নানে সমবেত লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন একই বেশে একই আচারে অংশ নেয়, তখন তাদের সকলের মধ্যে একধরনের যুথবদ্ধতা ও সরল মানবিক চেতনার ব্যাপ্তি বিরাজ

করে। এই অবস্থাই হল কমিউনিটাস। যে কাগুরু কিশোররা একই সাথে নগ্ন ও মুন্ডিত অবস্থায় বয়োপ্রাপ্তির আচারে অংশ নিচ্ছে, তারা সবাই সাময়িকভাবে হলেও একই সামাজিক তলে অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে সামাজিক পার্থক্যের চাইতে মিল ও সমতাই বেশী প্রকট হয়ে দেখা দেয়। টার্নার মনে করেন, অনেক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রধান কাজ হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক অসম কাঠামোর বিপরীতে ক্ষণস্থায়ীভাবে হলেও সাম্য, সহমর্মিতা ও যৌথতার একটা প্রতি-কাঠামো তৈরী করা।

সারাংশ

ধর্ম হচ্ছে বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত সত্তা, ক্ষমতা বা শক্তি সংক্রান্ত বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সামষ্টিক রূপ। 'অতিপ্রাকৃত' বলতে বোঝায় সেইসব বিষয় যেগুলোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক জগতের বাইরে বা উর্ধ্বে বলে গণ্য করা হয়, যেগুলোর অস্তিত্ব বা সত্যতা নির্ভর করে মানুষের বিশ্বাসের উপর। নৃবিজ্ঞানীদের মতে ধর্মের বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে জীবন ও জগতকে বোধগম্য, অর্থময় করে তুলে ধরা, মানসিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিরসনে ভূমিকা রাখা, এবং সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করা। ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মিথ, সেইসব কাহিনী যেগুলোতে জগত, সমাজ প্রভৃতির সৃষ্টি এবং গন্তব্য সম্পর্কে একটা জনগোষ্ঠীর মৌলিক বিশ্বাসসমূহ বিধৃত থাকে। অন্যদিকে আচার ধর্মের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আচারে বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটে, আবার আচার পালনের রয়েছে সামাজিক গুরুত্ব। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন আচার পালন মানুষকে বিভিন্ন ক্রান্তিকাল অতিক্রমে সাহায্য করে, এবং অনেক দলীয় আচার সমাজের সদস্যদের যৌথতা প্রকাশ ও লালনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। ধর্মের নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নে কার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ?

ক. এমিল ডুর্খাইম — খ. ই. বি. টায়লর

গ. ফ্রেজার — ঘ. রবার্ট ম্যারেট

২। কোন নৃবিজ্ঞানী ধর্মকে একটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখার উপর জোর দিয়েছে ?

ক. ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ — খ. ই. বি. টায়লর

গ. ফ্রেজার — ঘ. রবার্ট ম্যারেট

৩। 'মিথ' কী?

ক. ধর্মীয় কাহিনী — খ. বিশ্বাসের প্রথাবদ্ধ আচরিত রূপ

গ. অবান্তরের আচার — ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। 'অতিপ্রাকৃত' বলতে কী বোঝায়?

২। ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে ডুর্খাইম কোন্ ধারণার উপর জোর দিয়েছেন?

৩। মিথ বলতে কী বোঝায়?

৪। দ্বৈত বৈপরীত্য (binary opposition) কী?

৫। কমিউনিটাস (communitas) কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

২। আচার কী? আচারের নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর আলোকপাত করুন।

পাঠ - ২

সর্বপ্রাণবাদ, মহাপ্রাণবাদ ও মানা
Animism, Animatism & Mana

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- টায়লর প্রবর্তিত 'সর্বপ্রাণবাদের' ধারণা তথা ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব
- ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎপত্তি ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত অন্য একটি প্রত্যয় 'মহাপ্রাণবাদ'
- 'মানা' নামে অভিহিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অনেক দ্বীপবাসীদের মধ্যে প্রচলিত একটি ধর্মীয় ধারণার নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

ভূমিকা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উনিশ শতকের বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞানীরা ধর্মের আদিরূপ ও উৎপত্তি সম্পর্কে বেশ কিছু তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা এ ধরনের কিছু ধারণা ও তত্ত্বের সাথে পরিচিত হব। বিবর্তনবাদীদের দৃষ্টিতে তথাকথিত 'আদিম' সমাজসমূহের অবস্থান ছিল বিবর্তনের নিম্নতর ধাপসমূহে, ফলে সে হিসাবে চিহ্নিত সমাজসমূহের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের প্রতি তাদের নজর বেশী মাত্রায় কেন্দ্রীভূত ছিল। ধর্মের উৎপত্তি, আদিরূপ বা ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিবর্তনবাদীদের প্রণীত বিভিন্ন তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা পরবর্তীতে আর ব্যাপকভাবে অনুসৃত না হলেও তাদের ব্যবহৃত কিছু মৌলিক প্রত্যয় এখনো নৃবিজ্ঞানে চালু রয়েছে। এরকমই দুটি প্রত্যয় হল 'সর্বপ্রাণবাদ' (animism) ও 'মহাপ্রাণবাদ' (animatism)। নীচে এগুলির উপর আলোচনা করা হল।

সর্বপ্রাণবাদ

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই. বি. টায়লর (সংস্কৃতির একটি ধ্রুপদী সংজ্ঞার প্রণেতা হিসাবে যাঁর নাম আগেই উল্লেখিত হয়েছে) সর্বপ্রাণবাদের ধারণা নিয়ে আসেন। ইংরেজী animism শব্দটি এসেছে ল্যাটিন animus থেকে, যার অর্থ আত্মা (সে হিসাবে animism-এর বাংলা 'আত্মাবাদ' বা সে জাতীয় কিছু করা যেত, তবে এখানে পূর্বপ্রণীত পারিভাষিক প্রতিশব্দ 'সর্বপ্রাণবাদ' অনুসৃত হচ্ছে)। টায়লরের মতে সকল সংস্কৃতিতেই আত্মা বা আত্মা-সদৃশ অন্যান্য সত্তার ধারণা কোন না কোন আকারে দেখা যায়। এর ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে, সকল ধর্মের মূলে রয়েছে এই বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ, অর্থাৎ আত্মার ধারণায় বিশ্বাস, যাকে তিনি animism হিসাবে অভিহিত করেন। টায়লর ধর্মের একটি সরল সংজ্ঞাও দিয়েছেন, তাঁর মতে ধর্ম হল 'বিভিন্ন আত্মা-রূপীয় সত্তায় বিশ্বাস' (belief in spirit beings)। আত্মা-রূপীয় সত্তা বলতে টায়লর আত্মা তথা বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত, অশরীরী সত্তা যেমন ভূত-প্রেত, দেব-দেবী, ইশ্বর প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন। টায়লরের মতে আত্মার ধারণা ছিল আদিম মানুষদের একটি উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন, ধর্মের বিবর্তনের প্রথম ও প্রধান সোপান। তিনি তাঁর *Primitive Culture* গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, আত্মার ধারণার সম্প্রসারিত রূপ হিসাবেই বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ভূত-প্রেত দেব-দেবী প্রভৃতির ধারণা ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের উৎপত্তি ঘটেছে।

টায়লরের মতে সকল ধর্মের মূলে রয়েছে এই বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ, অর্থাৎ আত্মার ধারণায় বিশ্বাস, যাকে তিনি animism হিসাবে অভিহিত করেন। তাঁর মতে ধর্ম হল 'বিভিন্ন আত্মা-রূপীয় সত্তায় বিশ্বাস' (belief in spirit beings)।

টায়লর যুক্তি দেখান যে, স্বপ্ন, মৃত্যু, মুর্ছা যাওয়া ইত্যাদির মত কিছু সাধারণ ও সার্বজনীন মানবিক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়েই নিশ্চয় আদিম মানুষেরা আত্মার ধারণা উদ্ভাবন করে। মানুষ মাত্রেরই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা হয়। স্বপ্নে মানুষ যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করে, সেগুলোর সবকিছু জাগ্রত অবস্থার দৈনন্দিন ঘটনার সাথে মেলে না। মানুষ স্বপ্নে যেন ভিন্ন একটা জগতে বিচরণ করে। স্বপ্নে অনায়াসে দূরবর্তী কোন স্থানে ঘুরে আসা যায়, আকাশে উড়ে বেড়ানো যায়, এমনকি মৃত

ব্যক্তিদেরও সাক্ষাত মেলে। তার মানে প্রত্যেক মানুষের দেহের ভেতরেই নিশ্চয় এমন একটি দ্বিতীয় সত্তা বাস করে, যা আমরা ঘুমিয়ে থাকলে রক্তমাংসের দেহের বাইরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। মুর্ছা যাওয়া হল সাময়িকভাবে এই সত্তার দেহত্যাগ, আর মৃত্যুর বেলায় তা ঘটে চিরতরে। এমন অনেক 'আছরের' ঘটনাও ঘটে যখন একজন ব্যক্তি হঠাৎ ভিন্ন কারো মত আচরণ করতে থাকে, যেনবা তার মধ্যে অন্য কারো অশরীরী উপস্থিতি রয়েছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে এভাবেই স্বপ্ন, মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা খোঁজার প্রয়াসে 'আত্মা'র ধারণার আবির্ভাব ঘটে বলে টাইলর মনে করেন।

টায়লরের তত্ত্ব অনুযায়ী আত্মার ধারণার ভিত্তিতে ধর্মের একটি প্রাথমিক রূপ হিসাবে 'পূর্বপুরুষ পূজা'র (ancestor worship) আবির্ভাব ঘটে, যেখানে গোষ্ঠী-ভিত্তিক সমাজের সদস্যরা নিজ নিজ গোষ্ঠীর মৃত পূর্বসূরীদের আত্মাসমূহের সন্তুষ্টি বিধান ও সহায়তা লাভের লক্ষ্যে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করে। আবার বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে এই ধারণার বিকাশ ঘটে যে, শুধু মানুষেরই আত্মা নেই, অন্যান্য প্রাণীরও আত্মা রয়েছে, এমনকি জড়বস্তুর ভেতরেও আত্মা-রূপীয় সত্তা থাকতে পারে। এ ধরনের বিশ্বাসের ভিত্তিতে এক পর্যায়ে গড়ে ওঠে 'প্রকৃতি পূজা' (nature worship), যে ব্যবস্থায় চারপাশের জীবজন্তু, গাছপলা প্রভৃতি মানুষের কাছে আরাধ্য হয়ে ওঠে ('প্রকৃতি পূজা' কথাটা কিছুটা বিভ্রান্তিকর, কারণ এটি দিয়ে যে ধরনের বিশ্বাসকে বোঝানো হচ্ছে সেগুলোতে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে নিহিত বলে কল্পিত অতিপ্রাকৃত সত্তাসমূহই আসলে মানুষের কাছে ভীতি, ভক্তি বা পূজার বিষয়)। টায়লরের মতে 'প্রকৃতি পূজা'র আরো অগ্রসর ধাপে এসে মানুষ আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, বৃষ্টি, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর সন্ধান পায়। এভাবে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার বিকাশের সাথে সাথে বিশ্বজগতকে জানার-বোঝার নিরন্তর প্রয়াসের ফলশ্রুতি হিসাবে বহুইশ্বরবাদের (polytheism) পরবর্তী পর্যায়ে একেশ্বরবাদ (monotheism) এসেছে বলে টায়লর মনে করেন। একেশ্বরবাদী ধর্মীয় বিশ্বাসে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একক, অদ্বিতীয় ইশ্বরের ধারণা লক্ষ্য করা যায়। তবে একেশ্বরবাদী বিশ্বাসেও আত্মার ধারণা তথা ফেরেশ্তার মত গৌণ অতিপ্রাকৃত সত্তার স্থান রয়েছে। সে হিসাবে 'সর্বপ্রাণবাদ' অতীতে ফেলে আসা কোন স্তর নয়, বরং সকল সমকালীন ধর্মেই মিশে আছে।

টাইলরের তত্ত্বের প্রধান সমালোচনা হচ্ছে এই যে, শুধুমাত্র জীবন ও জগত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। ধর্ম মানুষের অন্যান্য চাহিদাও মেটায়।

টায়লরের তত্ত্বের প্রধান সমালোচনা হচ্ছে এই যে, শুধুমাত্র জীবন ও জগত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। ধর্ম মানুষের অন্যান্য চাহিদাও মেটায়। এছাড়া তথাকথিত আদিম সমাজসমহের মধ্যেও 'সর্বশক্তিমান ইশ্বর'-এর ধারণা বিরল নয়। সেদিক থেকে বিভিন্ন সমাজকে ধর্মীয় বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপে ফেলার প্রয়াস প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়ে। তবে টায়লরের সকল অনুমান যদি ঠিক নাও হয়, তাঁর বিশ্লেষণের পুরোটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। বিবর্তনবাদবিরোধী নৃবিজ্ঞানীরাও একটি মৌলিক প্রত্যয় হিসাবে সর্বপ্রাণবাদের ধারণা ব্যবহার করেন, যা ধর্মের নৃবিজ্ঞানে টায়লরের অবদানের স্বীকৃতি। আবার সর্বপ্রাণবাদ যে বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের একমাত্র বা প্রধানতম ভিত্তি, একথাও বলা যায় না। এক্ষেত্রে ভিন্ন একটি মৌলিক প্রত্যয় হিসাবে 'মহাপ্রাণবাদে'র ধারণার প্রতি এবার আমরা নজর দেব।

মহাপ্রাণবাদ ও মানা

ধর্মের উৎপত্তি ও মৌলিক রূপ সম্পর্কে টায়লর-প্রদত্ত ব্যাখ্যার বিকল্প অনুসন্ধান করতে গিয়ে রবার্ট ম্যারেট নিয়ে আসেন animatism-এর ধারণা, যার বাংলা করা হয়েছে 'মহাপ্রাণবাদ'। ধর্ম হচ্ছে আত্মা-রূপীয় বিভিন্ন সত্তায় বিশ্বাস, টায়লরের এই সংজ্ঞাকে ম্যারেট অতি সংকীর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অনেক ধর্মেই এমন কিছু শক্তি বা ক্ষমতার ব্যাপারে বিশ্বাস দেখা যায় যেগুলিকে সরাসরি কোন অতিপ্রাকৃত সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেখা হয় না। বিভিন্ন কিছুর মধ্যে এ ধরনের বিশেষ শক্তির উপস্থিতি বা প্রভাব সংক্রান্ত বিশ্বাসকে 'সর্বপ্রাণবাদ' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মেলানেশীয় ও পলিনেশীয় সমাজসমূহে এক ধরনের অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ক্ষমতার ব্যাপারে ব্যাপক

বিশ্বাস দেখা যায়। এই শক্তিকে একাধিক মেলানেশীয় ভাষায় 'মানা' (mana) বলা হয়, যে শব্দটা নৃবিজ্ঞানীরা অনুরূপ সকল ধারণাকে সাধারণভাবে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করে (দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের কৃষ্ণকায় আদিবাসী-অধ্যুষিত বেশ কিছু দ্বীপপুঞ্জকে একত্রে মেলানেশিয়া বলা হয়, যার অন্তর্গত রয়েছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি প্রভৃতি। অন্যদিকে হাওয়াইসহ প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য আরো কিছু দ্বীপপুঞ্জকে একত্রে পলিনেশিয়া বলা হয়)।

'মানা' বলতে এমন একটা বিশেষ শক্তি বা গুণকে বোঝায় যা বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মেলানেশীয় ও পলিনেশীয় বিশ্বাস অনুসারে এই গুণের অধিকারী ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। যেমন, কোন ব্যক্তি হয়ত মাছ ধরার কাজে সবসময় বা প্রায়ই বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। সেক্ষেত্রে বলা হয় যে, সে অন্যদের চেয়ে বেশী 'মানা'র অধিকারী। অথবা, কোন জমিতে খুব ভাল ফসল হওয়ার কারণ হিসাবে হয়ত 'মানা'-গুণ সম্পন্ন বিশেষ কোন বস্তু, যেমন অসাধারণ আকৃতির কোন পাথরের উপস্থিতিকে বিবেচনা করা হয়।

'মানা' বলতে এমন একটা বিশেষ শক্তি বা গুণকে বোঝায় যা বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

'মানা'র পেছনে কোন দৈবসত্তা বা ইশ্বররূপী কারো হাত রয়েছে, এমনটা ভাবা হয় না। বিশেষ বিশেষ উপায়ে, নির্দিষ্ট কিছু জাদুধর্মী আচার-পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে, 'মানা' অর্জন করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। ম্যারেট মনে করেন যে, আত্মা, ভূত-প্রেত, দেব-দেবী প্রভৃতি ধারণার আবির্ভাবের আগেই 'মানা' জাতীয় শক্তির উপস্থিতি ও ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মেছিল। এ ধরনের বিশ্বাসের পেছনে বিশেষ কোন যুক্তি কাজ করে না, যতটা যুক্তি হয়ত আত্মা বা ভূত-প্রেত সংক্রান্ত বিশ্বাসের বেলায় দেখা যায়। 'একেশ্বরবাদ' যদি হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের সবচাইতে বিবর্তিত ও যুক্তিসিদ্ধ রূপ, তাহলে 'মহাপ্রাণবাদ' হবে এর আদিমতম রূপ, অন্ততঃ ম্যারেটের মতে। অবশ্য সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস শুধুমাত্র তথাকথিত আদিম মানুষদের মধ্যেই সীমিত নয়। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, 'মানা'র মত ধারণা আমাদের কাছেও একেবারে অপরিচিত নয়। যেমন, বিশেষ কোন ব্যাট হাতে বা বিশেষ কোন জার্সি গায়ে খেললে ভাল রান তোলা বা বেশী উইকেট পাওয়া সম্ভব, এ কথা যদি কোন ক্রিকেটার বিশ্বাস করে - বাস্তবে যে ধরনের অনেক উদাহরণ আমরা দেখি - তা হবে অনেকটা 'মানা' সম্পর্কে মেলানেশীয় বিশ্বাসের অনুরূপ।

সর্বপ্রাণবাদ ও মহাপ্রাণবাদ ধারণার মূল্যায়ন

টায়লর ও ম্যারেট উভয়েই বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসসমূহ পর্যালোচনা করে কিছু সাধারণীকরণের ভিত্তিতে যথাক্রমে 'সর্বপ্রাণবাদ' ও 'মহাপ্রাণবাদ'কে ধর্মীয় বিশ্বাসের আদি ভিত্তি হিসাবে সনাক্ত করেছেন। তাদের উভয়ের ব্যাখ্যা অনেকটা অনুমান নির্ভর। ঠিক কেন, কিভাবে সুদূর অতীতে মানুষের মনে 'মানা' জাতীয় শক্তি বা আত্মা, ভূত-প্রেত ইত্যাদি সত্ত্বা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মাল, তা নিশ্চিত করে বলা প্রায় অসম্ভব। অবশ্য উপরের আলোচনাতেই আমরা দেখেছি যে, 'সর্বপ্রাণবাদ' বা 'মহাপ্রাণবাদ' প্রত্যয় শুধুমাত্র তথাকথিত আদিম সমাজ সমূহের ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং এগুলি সমকালীন প্রেক্ষিতেও প্রযোজ্য। সে হিসাবে এ ধরনের প্রত্যয়ের বিশ্লেষণী মূল্য রয়েছে। তবে টায়লর ও ম্যারেট উভয়ের বিশ্লেষণে যে বিষয়টা তেমন বিবেচনায় নেওয়া হয় নি, তা হল, ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সমাজ কাঠামোর সম্পর্ক।

কোন বিশ্বাসকে আমরা 'সর্বপ্রাণবাদ' বা 'মহাপ্রাণবাদ' ধারণার আলোকে কিছুটা বুঝতে সক্ষম হতে পারি, কিন্তু সেটাকে বিশদভাবে জানতে-বুঝতে গেলে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও অন্যান্য প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেওয়া জরুরী। যেমন, 'মানা' সংক্রান্ত বিশ্বাস মেলানেশিয়া ও পলিনেশিয়া, উভয় অঞ্চলে সাধারণভাবে দেখা যায়, তবে অঞ্চলেভেদে এই বিশ্বাসের সুনির্দিষ্ট রূপের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। সাধারণভাবে মেলানেশীয়দের তুলনায় পলিনেশীয় সমাজ ব্যবস্থা অধিকতর স্তরায়িত ছিল। মেলানেশীয় সমাজে একজন ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সমাজে মর্যাদার আসন লাভ করতে পারত, এবং সেখানে এমন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, যে কেউ চেষ্টা করে বা ভাগ্যক্রমে 'মানা' শক্তির অধিকারী হতে পারে।

অন্যদিকে পলিনেশীয় সমাজে, যেখানে গোষ্ঠীপ্রধানের পদ ছিল, যা বংশানুক্রমে নির্ধারিত হত, 'মানা' সবার জন্য সমানভাবে লভ্য ছিল না। একজন গোষ্ঠীপ্রধান সমাজের অন্যদের তুলনায় সব সময়ই অধিক 'মানা'র অধিকারী বলে বিবেচিত হত, এবং তার এই বিশেষত্বের কারণে সাধারণ মানুষদের তার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে হত (কারণ 'মানা' এমন একটা শক্তি বলে বিবেচিত হত, বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়া যেটির সংস্পর্শ বিপদ ডেকে আনতে পারে)। কাজেই দেখা যায়, 'সর্বপ্রাণবাদ', 'মহাপ্রাণবাদ', 'মানা' প্রভৃতি ধারণার সাধারণ বিশ্লেষণী মূল্য থাকলেও এগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপটের নির্দিষ্টতার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। অন্যভাবে বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট সমাজের বিশেষ কোন বিশ্বাসকে 'সর্বপ্রাণবাদ' বা অনুরূপ কোন নামে অভিহিত করা গেলেই সেটাকে আমাদের বোঝা হয়ে যায় না, বরং তা হবে আমাদের অনুধাবনের প্রয়াসের একটা প্রাথমিক ধাপ মাত্র।

সারাংশ

ধর্মের উৎপত্তি ও আদিরূপ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানে 'সর্বপ্রাণবাদ' ও 'মহাপ্রাণবাদ' প্রত্যয়দ্বয় প্রবর্তিত হয়। সর্বপ্রাণবাদ বলতে টায়লর বুঝিয়েছেন আত্মা ও অনুরূপ অন্যান্য অতিপ্রাকৃত সত্তা সংক্রান্ত বিশ্বাসকে, যেটাকে তিনি ধর্মের ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। টায়লরের মতে আত্মার ধারণার সম্প্রসারিত ও সর্বোচ্চ বিবর্তিত সংস্করণ হচ্ছে সর্বশক্তিমান এক ইশ্বরের ধারণা। টায়লরের তত্ত্বের বিপরীতে ম্যারেট দাবী করেন যে, অতিপ্রাকৃত সত্তার ধারণায় উপনীত হওয়ার আগে আদিম মানুষ প্রথমে প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত এক ধরনের শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করেছিল। মেলানেশীয়দের মধ্যে প্রচলিত 'মানা'র ধারণা হচ্ছে এরকম একটি উদাহরণ। 'মানা'কে কোন দৈব সত্তার নিয়ন্ত্রণাধীন হিসাবে দেখা হয় না, বরং এটা হচ্ছে এমন একটা শক্তি যা মানুষ বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে বা ঘটনাচক্রে আয়ত্ত করতে পারে। এ ধরনের বিশ্বাসকে 'মহাপ্রাণবাদ' বলা হয়। 'সর্বপ্রাণবাদ' ও 'মহাপ্রাণবাদ' প্রত্যয় যে ধরনের বিশ্বাসকে নির্দেশ করে, সে ধরনের বিশ্বাস বাস্তবে শুধুমাত্র তথাকথিত আদিম সমাজ সমূহের মধ্যেই সীমিত নয়, বরং সমকালীন প্রেক্ষিতেও লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। ইংরেজি অহরসরংস শব্দটি এসেছে কোন ভাষা থেকে ?

ক. গ্রীক　　খ. ল্যাটিন
গ. ফ্রেঞ্চ　　ঘ. স্পেনীশ

২। সর্বপ্রাণবাদের প্রবক্তা কে ?

ক. রবার্ট ম্যারেট　　খ. ই. বি. টায়লর
গ. এমিল ডুর্খাইম　　ঘ. জেমস্ ফ্রেজার

৩। মহাপ্রাণবাদের প্রবক্তা কে ?

ক. রবার্ট ম্যারেট　　খ. ই. বি. টায়লর
গ. জেমস্ ফ্রেজার　　ঘ. উপরের কেউই নন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। টায়লর ধর্মকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন?
২। টায়লরের মতে আদিম মানুষেরা কীভাবে আত্মার ধারণায় উপনীত হয়েছিল?
৩। 'প্রকৃতি পূজা' বলতে কী বুঝায়?
৪। 'মানা' কী?
৫। মেলানেশীয় ও পলিনেশীয়দের মধ্যে 'মানা' সংক্রান্ত বিশ্বাসের কী পার্থক্য রয়েছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে টায়লরের তত্ত্ব বর্ণনা ও মূল্যায়ন করুন।
২। নৃবিজ্ঞানে 'সর্বপ্রাণবাদ' ধারণার অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতা বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

ধর্ম, জাদু ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক
Relation between Religion, Magic and Science

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- ধর্মের নৃবিজ্ঞানে ব্যবহৃত একটি মৌলিক প্রত্যয় হিসাবে 'জাদু' ধারণার অর্থ ও গুরুত্ব
- ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ে ফ্রেজারের তত্ত্ব
- জাদুর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ভূমিকা সংক্রান্ত নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

জাদু (magic)

'জাদু' শব্দটা পড়লে বা শুনলে আপনার মানসপটে কি বিশেষ কোন ছবি ভেসে ওঠে? চট করে হয়ত টিভিতে দেখা জুয়েল আইচের জাদু বা সেরকম কোন কিছুর কথা আপনার মনে আসবে। এ ধরনের জাদু-প্রদর্শনী একধরনের শিল্পমাধ্যম, যার মূল উদ্দেশ্য বিনোদন। জুয়েল আইচের মত কোন জাদুশিল্পী যখন মাথার টুপি থেকে একগাদা কবুতর বের করে দেখান, বা একজন জ্যান্ত মানুষের শরীর দ্বিখন্ডিত করে দেখান, আমরা বিশ্বাস করি না যে তারা অলৌকিক কোন ক্ষমতার অধিকারী। বরং আমরা ধরে নেই যে এ ধরনের প্রদর্শনীর পেছনে রয়েছে 'হাতের কারসাজি', যা আমরা খেয়াল করতে বা বুঝতে পারি না। আমরা এ ধরনের জাদু-প্রদর্শনী থেকে বিনোদন লাভ করি, জাদুকরের দক্ষতায় চমৎকৃত হই। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানে 'জাদু' ধারণাটি ব্যবহৃত হয় ব্যাপকতর পরিসরে, বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত বেশ কিছু বিশ্বাস ও চর্চাকে বোঝানোর জন্য। যেমন, যখন আমরা পত্রিকায় পড়ি যে. বৃষ্টির আশায় কোন গ্রামের অধিবাসীরা 'ব্যাঙের বিয়ে'র আয়োজন করেছে, যখন শুনি যে কারো মন জয়ের আশায় উদ্দীষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত পানের খিলি খাওয়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, বা যখন কারো ক্ষতি করার জন্য 'বাণ মারা' হয়--এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস, আচরণ বা কর্মকান্ডসমুহ নৃবিজ্ঞানের ভাষায় 'জাদু' ধারণার আওতায় পড়ে। (ইংরেজী magic-এর প্রতিশব্দ হিসাবে এখানে আমরা বাংলা 'জাদু' ব্যবহার করছি। সমার্থক বা সম্পর্কিত অন্যান্য বাংলা শব্দের মধ্যে রয়েছে ভেল্‌কি, ভোজবাজি, ইন্দ্রজাল, মায়াবিদ্যা, কুহক, ডাইনি-বিদ্যা ইত্যাদি।)

মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে বিশেষ কলাকৌশল প্রয়োগ করে অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সত্তাসমূহকে বশে আনা যায়, সেগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইপ্সিত ফলাফল অর্জন করা যায়, তখন এ ধরনের বিশ্বাস ও কলাকৌশলকে নৃবিজ্ঞানীরা 'জাদু' হিসাবে চিহ্নিত করেন। আধূনিক কালের জাদুশিল্পীরা 'ভান করেন' যে তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু বাস্তবে তারা বা তাদের দর্শকরা জানে যে চোখের সামনে যা ঘটছে তার সবই সাজানো। অন্যদিকে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের আশায় বা বিশেষ কোন লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে যারা নিজেরা জাদুর চর্চা করে বা জাদু-বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়, তারা সচরাচর সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে যে নির্দিষ্ট কিছু কলাকৌশল যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে ইপ্সিত ফলাফল পাওয়া যায়।

জাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞান: ফ্রেজারের বিশ্লেষণ

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী জেমস ফ্রেজার জাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার পার্থক্য এবং সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর *The Golden Bough* নামক বিখ্যাত একটি গ্রন্থে। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞানীদের মত তিনিও আগ্রহী ছিলেন ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যায়। তাঁর মতে মানব সমাজে জাদুর অস্তিত্ব ছিল ধর্মের উৎপত্তির আগে। জাদুর সাহায্যে অতিপ্রাকৃতকে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়, এই

উপলব্ধি থেকে প্রকৃত ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল বলে ফ্রেজার মনে করেন। প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা বা দৃষ্টিভঙ্গী বলতে টাইলর সেই অবস্থাকে বুঝিয়েছেন যখন মানুষ মনে করে যে অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সত্তাসমূহ তার আজ্ঞাধীন নয়, এবং এই উপলব্ধি তার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার বোধ এনে দেয়। প্রার্থনা হচ্ছে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ। আমরা দেব-দেবী বা ইশ্বরের কাছে বিশেষ কিছু চাইতে পারি, কিন্তু এটা ধরে নিতে পারি না যে, যা আমরা চাইব, তা পাবই। পক্ষান্তরে জাদু-বিশ্বাস অনুসারে নির্দিষ্ট কোন কলাকৌশল যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে কাঙ্খিত ফলাফল আসতে বাধ্য। ধর্মে মানুষ অতিপ্রাকৃতের ইচ্ছ-অনিচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়, কিন্তু জাদুতে সে চেষ্টা করে অতিপ্রাকৃতকে বশে আনার। এদিক থেকে জাদু-বিশ্বাসের মধ্যে এক ধরনের ঔদ্ধত্য কাজ করে।

ফ্রেজার মনে করেন আদিম মানুষ ইচ্ছা-পূরণের উপায় মনে করে জাদুর উদ্ভাবন ঘটিয়েছিল। চারপাশের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক বা যোগসূত্র আবিস্কারের চেষ্টা করেছিল এবং সেগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা

ফ্রেজার মনে করেন আদিম মানুষ ইচ্ছা-পূরণের উপায় মনে করে জাদুর উদ্ভাবন ঘটিয়েছিল। চারপাশের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক বা যোগসূত্র আবিস্কারের চেষ্টা করেছিল এবং সেগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিল। এক্ষেত্রে দুই ধরনের অনুমানের ভিত্তিতে জাদুবিশ্বাস ও সংশ্লিষ্ট কলাকৌশলের উদ্ভাবন ঘটানো হয়েছে বলে ফ্রেজার মনে করেন। এক ধরনের অনুমান হচ্ছে এই যে, সদৃশ বস্তুসামগ্রীর ব্যবহার ও অনুকরণমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন সম্ভব। যেমন, কোন ব্যক্তিকে হত্যার লক্ষ্যে যদি তার প্রতিমূর্তি বানিয়ে সেটাকে অনবরত খোঁচানো হয়, তবে এক্ষেত্রে উক্ত অনুমান কাজ করছে। এ ধরনের জাদু হচেছ অনুকরণমূলক বা সাদৃশ্যনির্ভর (imitative or homeopathic magic)। দ্বিতীয় যে আরেক ধরনের অনুমানের ভিত্তিতে অনেক জাদু কাজ করে তা হল এই যে, কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় তার সাথে সংস্পর্শে ছিল বা থাকবে, এমন কোন কিছুর মাধ্যমে। যেমন, কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের বা তাকে বশ করার লক্ষ্যে তার মাথার চুল, নখ ইত্যাদি ব্যবহার করা হতে পারে, অথবা বিশেষ উপায়ে তৈরী কোন দ্রব্য তার সংস্পর্শে আনার ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এ ধরনের জাদু হচ্ছে সংস্পর্শ-নির্ভর (contagious magic)।

ফ্রেজারের তত্ত্ব অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পথে ক্রমান্বয়ে জাদু-বিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার আবির্ভাব ঘটেছে।

ফ্রেজারের তত্ত্ব অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পথে ক্রমান্বয়ে জাদু-বিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী জাদুবিশ্বাসের ভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে মানুষ যুক্তির একটি উর্ধ্বতন স্তরে তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে দেব-দেবী বা ইশ্বরের ধারণা গড়ে তোলে এবং এসব সত্তার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। অন্যদিকে জাদু-বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা ক্ষেত্রে মিল আছে, তা হল, জাদু-চর্চাকারী ও বিজ্ঞানী, উভয়েই ধরে নেয় যে, যথোপযুক্ত পরিবেশে সঠিক পন্থায় 'ক' কাজটি সম্পাদিত হলে যথাসময়ে 'খ' ফলাফল পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে কে কাজটি করল, উদ্দীষ্ট ফলাফল সম্পর্কে তার মনোভাব কি, এগুলো বিচার্য নয়। পক্ষান্তরে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বলতে ফ্রেজার যা বুঝিয়েছেন, তাতে মানুষের মনের ভেতরে কি রয়েছে, সে বিষয়টাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জাদুর কলাকৌশলের পেছনে সচরাচর কোন সুনির্দিষ্ট কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই ফ্রেজারের ভাষায় জাদু হচ্ছে 'ভ্রান্ত বিজ্ঞান'।

জাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞান ধারণাসমূহ ফ্রেজার যে ধরনের অর্থে ব্যবহার করেছেন, সেগুলি বোঝানোর জন্য এখানে আমরা কিছু বাস্তব উদাহরণ বিবেচনায় নিতে পারি। জাদুর একটি উদাহরণ হিসাবে বৃষ্টির আশায় 'ব্যাঙের বিয়ে' দেওয়ার রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটু ভাবুন, কোন্ অর্থে এই রীতির পেছনে জাদু-বিশ্বাস ক্রিয়াশীল? আল্লাহ্ বা ইশ্বরে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি হয়ত বলবেন, বৃষ্টি নামা না নামা সম্পুর্ণ আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কাজেই বৃষ্টি চাইলে 'মোনাজাত' করাই শ্রেয়। পক্ষান্তরে একজন বিজ্ঞানী প্রকৃতির বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বৃষ্টির সম্ভাব্যতা নিরূপণ করবেন, এবং, তিনি আস্তিক বা নাস্তিক যাই হোন না কেন, আকাশে বিশেষ কোন পদার্থ ছড়িয়ে দিয়ে মেঘ তৈরী করে বৃষ্টি নামানোর কোন ব্যবস্থা থাকলে তিনি প্রয়োজনে তা কাজে লাগাবেন। 'ব্যাঙের বিয়ে' দিলে বৃষ্টি হবেই, এটা ধর্মীয়

যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। সেই অর্থে এই রীতির পেছনে কাজ করছে এক ধরনের জাদু বিশ্বাস।

জাদুর 'কার্যকারিতা'

জাদু শুধু তথাকথিত আদিম বা অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যেই দেখা যায় না। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, আধুনিক শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও এমন অনেক বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত যেগুলোকে জাদু-ধর্মী বলে শনাক্ত করা সম্ভব। যেমন, বিশেষ কোন জার্সি গায়ে মাঠে নামলে খেলায় ভাল করা সম্ভব, এ ধরনের বিশ্বাস ক্রীড়াজগতে দুর্লভ নয়। বহুকাল আগে থেকেই জাদুর বিরুদ্ধে ধর্ম-সংস্কারকদের অনেকে শুদ্ধি অভিযান চালিয়েছেন, কিন্তু বিশ্বের প্রায় সকল ধর্মের অনুসরীদের মধ্যেই বিভিন্ন মাত্রায় জাদুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ফ্রেজার প্রণীত জাদু ও ধর্মের ধারণাগত পার্থক্যকে অনুসরণ করা হলেও বাস্তবে এ দু'টির মধ্যে সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। যে গ্রামবাসীরা ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করে, তারাই হয়ত বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা বা মোনাজাতেও শরীক হতে পারে।

জাদুর যদি কোনই কার্যকারিতা না থাকে, যদি ফ্রেজারের বিশ্লেষণ অনুসারে জাদুর ব্যর্থতা থেকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে বহু সমাজেই জাদু এতদিনে প্রায় পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যেত। তথাপি তা ঘটে নি কেন? ক্রিয়াবাদীরা উক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন, ম্যালিনোস্কি দেখিয়েছেন যে, ট্রবিরিয়ান্ড দ্বীপবাসীরা সেসব কর্মকান্ডেই জাদুর আশ্রয় নিয়ে থাকে যেগুলোতে ফলাফলের ব্যাপারে কখনো নিশ্চিত হওয়া যায় না। ফসল ফলানোর জন্য প্রযুক্তিগতভাবে যা যা করা সম্ভব, সবকিছু করা হলেও নানা কারণে ফসল হানি ঘটতে পারে। বা আন্তঃদ্বীপ যাত্রায় সবচাইতে দক্ষ নৌচালকও দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে জাদু-নির্ভর আচার অনুষ্ঠান উদ্বেগ নিরসনে ভূমিকা রাখে বলে ম্যালিনোস্কি মনে করেন। বিভিন্ন কর্মকান্ডে ভয়-ভীতি ও উৎকণ্ঠা কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জনে যদি জাদু ভূমিকা রাখে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে সাফল্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই অর্থে জাদুর অবশ্যই কিছু কার্যকারিতা রয়েছে।

যারা জাদু-ধর্মী আচার অনুষ্ঠান পালন করে, তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও অনেক ক্ষেত্রেই জাদুর কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশ্বাস রাখতে সহায়তা করে। যেমন, ব্যাঙের বিয়ে সম্পন্ন করার পর সত্যি সত্যিই বৃষ্টি নেমেছে, এমন সাক্ষ্য দেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। ব্যাঙের বিয়ের জন্য ব্যাঙ খুঁজে পাওয়ার দরকার রয়েছে। এখন, যদি দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ খুঁজে পাওয়া একেবারে সহজ হবে না। বিষয়টা এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, বৃষ্টির আভাস পেলে ব্যাঙেরা বেরিয়ে পড়ে, এবং এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই বহু আগে হয়ত 'ব্যাঙের বিয়ে' অনুষ্ঠানের রীতি গড়ে ওঠে। তবে এ ধরনের অনুষ্ঠানের পেছনে প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ থেকে লব্ধ যে ধরনের জ্ঞানই থেকে থাকুক না কেন, অন্য একটি পর্যায়ে সেগুলির কার্যকারিতা রয়েছে। কৃষি-নির্ভর সমাজে যথাসময়ে বৃষ্টি না হওয়াটা সবার জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে, সম্ভাব্য বিপর্যয়ের আশঙ্কায় সমাজের সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চিন্তার প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সবাই মিলে দল বেঁধে ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করুক আর বৃষ্টির জন্য সমবেত মোনাজাত বা প্রার্থনার আয়োজন করুক, তাতে সবাই মিলে সংকটের বোধকে সামাল দিতে পারে, সমাজে যৌথতার বন্ধন দৃঢ় হয়। বিজ্ঞানের প্রসার সত্ত্বেও জাদু ও ধর্মের অব্যাহত আবেদনের পেছনে এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

সারাংশ

ধর্মের নৃবিজ্ঞানে জাদু একটি বহুল আলোচিত প্রত্যয়। অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সত্তাসমূহকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অনুসৃত বিভিন্ন কলাকৌশল বা তৎসংক্রান্ত বিশ্বাসকে বোঝাতে নৃবিজ্ঞানে জাদু ধারণা ব্যবহার করা হয়। ফ্রেজারের মতে, জাদু হচ্ছে অতিপ্রাকৃত শক্তি ও সত্তাসমূহের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা বিকশিত হওয়ার পূর্বতন ধাপ। অতিপ্রাকৃত সত্তাসমূহ যে মানুষের নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে, এই উপলব্ধি জন্মানোর পর সূচিত হয় প্রকৃত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী, যখন মানুষ এই সত্তাসমূহের কাছে নতি স্বীকার করে। ফ্রেজার জাদুকে 'ভ্রান্ত বিজ্ঞান' হিসাবে চিহ্নিত করলেও ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানীরা জাদু-ধর্মী বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উপযোগিতা দেখতে পেয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। 'ব্যাঙের বিয়ে' দিলে বৃষ্টি হবে - এটি কোন ধরনের বিশ্বাস ?

ক. বৈজ্ঞানিক বিশে- ষণ　　খ. ধর্মীয় বিশ্বাস
গ. যাদু বিশ্বাস　　ঘ. ধর্মীয় ও যাদু বিশ্বাস

২। 'The Golden Bough' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

ক. ই. বি. টায়লর　　খ. হেনরী মর্গান
গ. জেমস্ ফ্রেজার　　ঘ. রবার্ট ম্যারেট

৩। 'The Golden Bough' গ্রন্থটির বিষয়বস্তু কী?

ক. ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক
খ. ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সম্পর্ক
গ. যাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্য এবং সম্পর্ক
ঘ. যাদু, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বলতে ফ্রেজার কী বুঝিয়েছেন?
২। অনুকরণমূলক জাদু বলতে কী বোঝায়?
৩। সংস্পর্শ-নির্ভর জাদুর ধারণা ব্যাখ্যা কর।
৪। বৃষ্টির জন্য 'ব্যাঙের বিয়ে' আয়োজন আর মোনাজাতের মধ্যে পার্থক্য কী?
৫। জাদুকে কেন 'ভ্রান্ত বিজ্ঞান' বলা হয়েছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নৃবিজ্ঞানে জাদু বলতে কী বোঝায়? জাদু ও ধর্মের পার্থক্য এবং সম্পর্ক বিষয়ে ফ্রেজারের বিশ্লেষণ তুলে ধরুন।
২। ফ্রেজার জাদুকে 'ভ্রান্ত বিজ্ঞান' হিসাবে অভিহিত করলেও জাদুকে পুরোপরি 'অবৈজ্ঞানিক' বলা যায় না - আপনি কী একমত? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ - ৪

ধর্মীয় আন্দোলন : কার্গো কাল্ট, ব্রাহ্ম ও ফরায়েজী আন্দোলন
Religious Movements : Cargo Cult Movement, Brahmo and Faraizi Movement

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- ধর্মীয় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও প্রকারভেদ
- মেলানেশীয়দের মধ্যে সংঘটিত 'কার্গো কাল্ট' আন্দোলন
- উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষক সমাজে সংঘটিত ফরায়েজী আন্দোলনের বিবরণ ও বিশ্লেষণ
- উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালী হিন্দু সমাজের একাংশের মধ্যে সূচিত 'ব্রাহ্ম আন্দোলন'

পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন

ধর্মের কার্যাবলী আলোচনার সময় এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে যে, ধর্ম সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। তবে একথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, ধর্ম সমাজ পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় সকল প্রধান ধর্মেরই আবির্ভাব ঘটেছে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বা প্রয়াসে। এছাড়া সরাসরি নূতন কোন ধর্মের প্রবর্তন না ঘটলেও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে অনেক পরিবর্তনকামী আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে ধর্মীয় ভাবাদর্শের আলোকে। স্বাভাবিক ভাবেই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ধর্মীয় আন্দোলনের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে ধর্মীয় আন্দোলনের বিষয়টি নৃবিজ্ঞানে বিশেষভাবে নজরে এসেছে একটা সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে - ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মুখে নৃবিজ্ঞানীদের অধীত বিভিন্ন উপনেবিশত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, সেগুলির একটা অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার আলোকে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলন। নৃবিজ্ঞানীরা এ ধরনের আন্দোলনকে ইংরেজীতে nativistic, revivalistic, millenarian, messianic ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন, যেগুলোকে সাধারণভাবে বোঝানোর জন্য এন্থনি ওয়ালেস revitalization movement প্রত্যয়টি চালু করেন, হয়েছে, যার বাংলা করা যেতে পারে 'পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন'।

পুনরীজ্জবনবাদী আন্দোলনসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচিত কোন নেতার অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে।

ঔপনিবেশিক, বর্ণবাদী বা শ্রেণী ও জাতিগত বৈষম্যমূলক নিপীড়নের মুখে পতিত কোন অধস্তন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সূচিত ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। কোন কোন আন্দোলনে নূতন কিছুকে গ্রহণ করার পরিবর্তে পুরাতন কিছুকে আঁকড়ে থাকার বা লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যকে নবউদ্যমে ফিরিয়ে আনার প্রবণতা দেখা যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে নূতন ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রসার ঘটতে পারে। কোন কোন আন্দোলনে এক ধরনের নিষ্ক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাবল্য থাকতে পারে, যেখানে ক্ষমতাসীনদের সাথে সংঘাত ও সংঘর্ষ পরিহার করে চলা হয় এবং ইহজাগতিক মুক্তির পরিবর্তে পারলৌকিক পরিত্রাণের উপর জোর দেওয়া হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের প্রত্যক্ষ আহ্বান থাকতে পারে, এবং শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক, সশস্ত্র কর্মকান্ড পরিচালিত হতে পারে। পুনরীজ্জবনবাদী আন্দোলনসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচিত কোন নেতার অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে।

উনিশ শতকে উত্তর আমেরিকার অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত একটা বিশেষ ধরনের ধর্মীয় আন্দোলন, যা 'প্রেত নৃত্য' (Ghost Dance) নামে অভিহিত, পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের দৃষ্টান্ত। উক্ত আন্দোলনে আদিবাসীদের মৃত পূর্বসূরীরা প্রেত-জগত থেকে ফিরে এসে শ্বেতাঙ্গদের নির্মূল করতে সহায়তা করবে, এই ধরনের ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাসীরা সেই প্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি হিসাবে ব্যাপকভাবে নৃত্য-নির্ভর আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রেই এই

'প্রেত নৃত্য'সমূহ সংশ্লিষ্ট আদিবাসীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছিল, এবং তাদের অনেকে শ্বেতাঙ্গদের বন্দুকের গুলি ঠেকাতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করা হত, এমন জাদুকরী জামা গায়ে পরিধান করে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ আগ্রাসীদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের মুখে এ ধরনের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায় বা অর্ন্তমুখী রূপ লাভ করে।

বিশ্বের অন্যান্য উপনেবিশিত অঞ্চলেও আমেরিকার আদিবাসীদের প্রতিক্রিয়ার অনুরূপ আন্দোলন লক্ষ্য করা গেছে, যেগুলির মধ্যে মেলানেশীয়দের মাঝে পরিলক্ষিত 'কার্গো কাল্ট' নামে পরিচিত আন্দোলনের প্রতি নীচে আমরা নজর দেব। কিছুটা ভিন্ন চরিত্রের হলেও এই উপমহাদেশেও ব্রিটিশ শাসনের সময় বেশ কিছু ধর্মীয় সংস্কারবাদী বা পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যেগুলির মধ্যে আমরা 'ব্রাহ্ম আন্দোলন' ও 'ফরায়েজী আন্দোলন' সম্পর্কে নীচে আলোচনা করব।

কার্গো কাল্ট (Cargo Cult)

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শিকার হওয়ার পর বর্তমান পাপুয়া নিউ গিনি ও মেলানেশিয়া অঞ্চলের অনেক দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে একসময় এ ধরনের বিশ্বাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তাদের মৃত পূর্বপুরুষেরা জাহাজে (বা উড়োজাহাজে) ইউরোপীয় দ্রব্যসামগ্রী বোঝাই করে ফিরে আসবে, এবং এই ধরনের বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন স্থানে দলে দলে অনেকে বিভিন্ন জাদু-নির্ভর আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকে। এই প্রবণতার বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশকেই সাধারণভাবে 'কার্গো কাল্ট' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে ('কার্গো' শব্দ দিয়ে জাহাজ বা উড়োজাহাজের মালামালকে বোঝায়, অন্যদিকে 'কাল্ট' শব্দের বাংলা প্রেক্ষাপট-ভেদে 'পূজা', 'ধর্ম' ইত্যাদি হতে পারে)।

নৃবিজ্ঞানী পিটার ওর্স্‌লে (Worsley) কার্গো কাল্টসমূহের যে বিবরণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন, তা থেকে জানা যায়, প্রায় চারশ' বছর আগে থেকে ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসার পর ধীরে ধীরে মেলানেশীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা তৈরী হয়। মিশনারীরা ধর্ম প্রচার শুরু করার পর মেলানেশীয়রা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ হলে তারা ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় দ্রব্যসামগ্রীর অধিকারী হবে, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। বরং, ইউরোপীয়দের বাগানে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার ফলে উল্টো তারা ব্যাপক সংখ্যায় স্থানচ্যুতি (নিজ এলাকা থেকে দূরে গিয়ে কাজ করতে হওয়া) ও অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়। এই পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে মেলানেশীয়দের মধ্যে যেসব প্রশ্ন দেখা যেতে থাকে, সেগুলোর উত্তর দিতে এগিয়ে আসে কিছু ধর্মীয় নেতা, যারা ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে যে মৃত পূর্বপুরুষরা জাহাজ-বোঝাই কাঙ্খিত দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে শীঘ্রই ফিরে আসবে, এবং তাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। অনেক জায়গাতে জাহাজ নোঙ্গর করার বা উড়োজাহাজ নামার জায়গা প্রস্তুত করা হত। বিশ্বাসীদের অনেকে পশ্চিমা পোশাক পরে পশ্চিমাদের কায়দায় কাগজে আঁকি-বুঁকি করত, যে ধরনের ক্রিয়ার জাদুকরী প্রভাবে তাদের কাছে কাঙ্খিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছে যাবে বলে তারা মনে করত।

আসলে কার্গো কাল্টের মাধ্যমে মেলানেশীয়রা শ্বেতাঙ্গদের ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনেরই চেষ্টা করছিল। তাদের চোখে শ্বেতাঙ্গরা যা কিছু করত, তা তাদের কাছে জাদুর মতই মনে হত। যেমন, তাদের চোখে বাগানের মালিক বা অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মকর্তারা কোন কাজ করত না, বরং সারাক্ষণ শুধু কাগজে কিসব রহস্যময় চিহ্ন আঁকত। কাজ করত স্থানীয়রা, অথচ দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য দেখা যেত শুধু ইউরোপীয়দের বেলায়। তার মানে ইউরোপীয়রা নিশ্চয় এমন কোন জাদু জানে, যা রপ্ত করা গেলে নিজেরাও প্রাচুর্যের অধিকারী হবে, এমন বিশ্বাস মেলানেশীয়দের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে। এভাবেই তারা ইউরোপীয়দের কর্মকান্ডের অনুকরণে বিভিন্ন জাদু-ধর্মী আচার-অনুষ্ঠানে লিপ্ত হতে থাকে। বাস্তবে অবশ্য মৃত পূর্বপুরুষরা কোথাও জাহাজ-বোঝাই করে মালামাল নিয়ে আসেনি। তবে প্রতিশ্রুত মালামাল এসে না পৌঁছালে ধর্মীয় নেতাদের অনেকে এই ব্যাখ্যা দিত যে, শ্বেতাঙ্গ লোকেরা জাহাজগুলোকে

আসলে কার্গো কাল্টের মাধ্যমে মেলানেশীয়রা শ্বেতাঙ্গদের ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনেরই চেষ্টা করছিল। তাদের চোখে শ্বেতাঙ্গরা যা কিছু করত, তা তাদের কাছে জাদুর মতই মনে হত।

ভিড়তে দেয় নি, তাদের প্রতারণার কারণে সেগুলো অন্যত্র নোঙ্গর করেছে, ইত্যাদি। মারভিন হ্যারিস বলেন, এই ব্যাখ্যা রূপক অর্থে সত্য ছিল বই কি। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে অযৌক্তিক আচরণ বা পাগলামি মনে হলেও কার্গো কাল্টের পেছনে একটা বৃহত্তর ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে ছিল বইকি।

ব্রাহ্ম আন্দোলন

এই আন্দোলন এমন এক সময়ে সূচিত হয়েছিল যখন ব্রিটিশ শাসনের আওতায় বাংলায় ব্যাপক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, বাঙালী সমাজে কলিকাতা-কেন্দ্রিক একটি নূতন শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, যাদের মাধ্যমে বাংলার একটা 'নবজাগরণ' ঘটেছিল বলে বলা

বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতকের গোড়ায় সূচিত ব্রাহ্ম আন্দোলন একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এই আন্দোলন এমন এক সময়ে সূচিত হয়েছিল যখন ব্রিটিশ শাসনের আওতায় বাংলায় ব্যাপক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, বাঙালী সমাজে কলিকাতা-কেন্দ্রিক একটি নূতন শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, যাদের মাধ্যমে বাংলার একটা 'নবজাগরণ' ঘটেছিল বলে বলা হয়। ব্রাহ্ম আন্দোলনের সাথে একজনের নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে, তিনি হলেন রামমোহন রায়। তবে এটি তাঁর একার আন্দোলন ছিল না, বরং সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও এতে তাঁর সাথে যাঁরা শরীক ছিলেন, যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁরা ছিলেন তৎকালীন সমাজের শিক্ষিত ও বিত্তবানদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রভাবশালী শ্রেণীর প্রতিনিধি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যের আলোকে আধুনিক প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য একেশ্বরবাদী ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। তবে এই আন্দোলনের লক্ষ্য বা ফলাফল শুধু ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যেই সীমিত ছিল না, বরং বৃহত্তর সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে এর প্রভাব পড়েছিল।

ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারীরা পৌত্তলিকতা পরিহার করে নিরাকার ইশ্বর বা ব্রহ্মার উপাসনার পথ বেছে নেয়, এবং মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মত সাপ্তাহিক সমবেত প্রার্থনা-সভার আয়োজন করেছিল।

ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান রামমোহন রায় বেশ অল্প বয়সেই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ফারসী ও আরবী ভাষায় তাঁর দখল ছিল এবং পরবর্তীতে তিনি ইংরেজীও রপ্ত করেন এবং সেসূত্রে তথা ব্যবসায়িক সূত্রে ইউরোপীয়দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে সমকালীন পশ্চিমা ধ্যান ধারণা সম্পর্কেও ঘনিষ্ঠভাবে অবগত হন। হিন্দু ধর্মের অনেক কিছু অযৌক্তিক, মিশনারীদের এ ধরনের প্রচারণার বিপরীতে রামমোহন রায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইসলামী বা খ্রিস্টীয় একেশ্বরবাদের অনুরূপ ধর্মীয় বিশ্বাস আদি বৈদিক ঐতিহ্যেও রয়েছে। এই ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারীরা পৌত্তলিকতা পরিহার করে নিরাকার ইশ্বর বা ব্রহ্মার উপাসনার পথ বেছে নেয়, এবং মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মত সাপ্তাহিক সমবেত প্রার্থনা-সভার আয়োজন করেছিল। একসময় মিশনারীদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন যে, রামমোহন রায় খ্রিস্টান হতে যাচ্ছিলেন। তিনি তা হন নি, তবে তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্ম রীতি-নীতিতে খ্রিস্টীয় প্রভাব শনাক্ত করা কঠিন নয়।

ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা বাংলার বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। যেমন, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় ছিলেন সোচ্চার। একইভাবে বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ চালু করা, ইত্যাদি সামাজিক আন্দোলনে ব্রাহ্মরা সক্রিয় ছিলেন।

রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগী-অনুসারীরা মূলতঃ কলিকাতায় গড়ে ওঠা শিক্ষিত ও বিত্তবান ভদ্রলোকদের শ্রেণীকেই প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁরা পশ্চিমা উদারনৈতিক চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, এবং আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংস্কার করে যুগোপযোগী করে তুলতে আগ্রহী করেন। একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় ধারা হিসাবে ব্রাহ্ম আন্দোলন পরবর্তীকালে তেমন প্রসার লাভ করে নি, তবে ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা বাংলার বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। যেমন, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় ছিলেন সোচ্চার। একইভাবে বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ চালু করা, ইত্যাদি সামাজিক আন্দোলনে ব্রাহ্মরা সক্রিয় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ব্যক্তিত্ব তথা ঠাকুর পরিবার ও অনুরূপ অন্যান্য প্রভাবশালী ব্রাহ্ম পরিবার একত্রে বাঙালী ভদ্রলোক শ্রেণীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কাজেই এসব বিবেচনায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

ফরায়েজী আন্দোলন

ফরায়েজী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অনৈসলামিক বলে বিবেচিত বিভিন্ন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান দূর করে কোরান-ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা।

উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজেও একাধিক ধর্মীয় সংস্কারবাদী আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। এগুলির একটি ছিল ফরায়েজী আন্দোলন, যা পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষক সমাজে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফরিদপুরের হাজী শরিয়তউল্লাহ্‌র (জন্ম: ১৭৮১ - মৃত্যু: ১৮৪০) নেতৃত্বে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যিনি হজ্জ করতে গিয়ে তখনকার আরবদেশে আলোড়ন তোলা ওয়াহাবী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ওয়াহাবী আন্দোলনের মতই ফরায়েজী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অনৈসলামিক বলে

বিবেচিত বিভিন্ন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান দূর করে কোরান-ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। হাজী শরিতউল্লাহ্‌র পুত্র ও অনুসারী দুদু মিঞার নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলন পূর্ব বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে তৎকালীন ফরিদপুর, বাখেরখঞ্জ, ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা ও নোয়াখালী জেলায়।

ফরায়েজী আন্দোলন অবশ্য শুধুমাত্র ধর্মীয় সংস্কারের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়নি, এর সাথে নিবিড়ভাবে মিশে ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি। জমিদার (যাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু) ও ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষক শ্রেণীর ক্ষোভ ও বিদ্বেষের প্রেক্ষিতে দুদু মিঞা ঘোষণা করেছিলেন যে সকল মানুষ সমান, এবং নিরলস প্রচারকার্য চালিয়ে বহু অনুসারী তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজেই ফরায়েজী আন্দোলন ধর্মীয় ভাবাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হলেও এটিকে শ্রেণী-সংগ্রাম তথা উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রাম হিসাবেও গণ্য করা যায়।

ফরায়েজী আন্দোলন অবশ্য শুধুমাত্র ধর্মীয় সংস্কারের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়নি, এর সাথে নিবিড়ভাবে মিশে ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি।

উপরে যেসব উদাহরণ আমরা আলোচনা করেছি, সেগুলো থেকে একটা বিষয় খুব স্পষ্টভাবেই বেরিয়ে আসে যে, পুনরুজ্জীবনবাদী বা অনুরূপ অন্য কোন নামে অভিহিত কোন ধর্মীয় আন্দোলনই শুধুমাত্র, বা এমনকি প্রধানত, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তন আনার ব্যাপার নয়। বরং বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় এ ধরনের আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সারাংশ

ধর্মীয় আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ রয়েছে, যেগুলির একটা বিশেষ বর্গকে 'পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের আন্দোলন লক্ষ্য করা যায় নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে। আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে পরিলক্ষিত 'প্রেত নৃত্য' বা মেলানেশীয়দের মধ্যে একসময় ছড়িয়ে পড়া 'কার্গো কাল্ট' হচ্ছে পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের উদাহরণ। বাংলায়ও একাধিক ধর্মীয় সংস্কারবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যেগুলোর মধ্যে ছিল পশ্চিমা সংস্কৃতি ও আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা লক্ষ্যে কলিকাতার শিক্ষিত-বিত্তবান শ্রেণীর কিছু মানুষের পরিচালিত ব্রাহ্ম আন্দোলন, এবং জমিদার ও নীলকরদের শোষণে অতিষ্ঠ পূর্ববাংলার দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে পরিচালিত ফরায়েজী আন্দোলন। ধর্মীয় ভাবাদর্শে পরিচালিত হলেও এ ধরনের আন্দোলনের পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। 'প্রেত নৃত্য' (Ghost Dance) কোন অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ?

ক. উত্তর আমেরিকার আদিবাসী সম্প্রদায় খ. দক্ষিন আমেরিকার আদিবাসী সম্প্রদায়
গ. আফ্রিকার আদিবাসী সম্প্রদায় ঘ. এশিয়ার আদিবাসী সম্প্রদায়

২। ব্রাহ্ম আন্দোলন কখন সংঘটিত হয় ?

ক. আঠারো শতকের গোড়ায় খ. আঠারো শতকের শেষে
গ. উনিশ শতকের গোড়ায় ঘ. উনিশ শতকের শেষে

৩। ফরায়েজী আন্দোলন কার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল ?

ক. হাজী শরিয়ত উল াহ খ. দুদু মিঞা
গ. তিতুমীর ঘ. উপরের কেউই নন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নৃবিজ্ঞানে কোন্ প্রেক্ষিতে ধর্মীয় আন্দোলনের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে?
২। 'প্রেত নৃত্য' কী?
৩। 'কার্গো কাল্ট' বলতে কী বোঝায়?
৪। রামমোহন রায় কে ছিলেন?
৫। হাজী শরিয়তউল্লাহ্‌র পরিচয় দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ এ ধরনের আন্দোলনের স্বরূপ আলোচনা করুন।
২। ব্রাহ্ম আন্দোলন ও ফরায়েজী আন্দোলনের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরুন।